ভারতচন্দ্র

শান্তিপুর সাহিত্য-সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ

গত বছর দু-তিন ধরে বাংলাদেশের মফস্বলে নানা সাহিত্য-সমিতির বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়মিত নিমন্ত্রিত হই। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ যে আমাকে তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করেন, এ আমার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কারণ এই সূত্রে প্রমাণ হয় যে, আমার পক্ষে বঙ্গ সাহিত্যের চর্চাটা বৃথা কাজ বলে গণ্য হয় নি। ভারতচন্দ্র বলেছেন—

যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে

বাঙালি জাতি যে মনে করে লেখা জিনিসটি আমার সাজে, এ কি আমার পক্ষে কম শ্লাঘার কথা?

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ অধিকাংশ নিমন্ত্রণই আমি রক্ষা করতে পারি নে। ইংরেজিতে যাকে বলে The spirit is willing, but the flesh is weak, আমার বর্তমান অবস্থা হয়েছে তাই। সমস্ত বাংলাদেশের ছুটে বেড়াবার মতো আমার শরীরে বলও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। যে স্বল্পপরিমাণ শারীরিক বল ও স্বাস্থ্যের মূলধন নিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করি, কালক্রমে তার অনেকটাই ক্ষয় হয়েছে ; যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু কৃপণের ধনের মতো সামলে ও আগলে রাখতে হয়। তৎসত্ত্বেও শান্তিপুরের নিমন্ত্রণ আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এর কারণ নিবেদন করছি।

প্রথমত, একটি চিরস্মরণীয় লেখক সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, এবং সে-সব কথা শোনবার অনুকূল শ্রোতার অভাব, আমার বিশ্বাস, এ নগরীতে হবে না। দ্বিতীয়ত, উক্ত সূত্রে আমার নিজের সম্বন্ধেও দু-একটি ব্যক্তিগত কথা বলতেও আমি বাধ্য হব। সমালোচকেরা যখন সাহিত্য-সমালোচনা করতে ব'সে কোনো সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনা শুরু করেন, তখন প্রায়ই তা আক্ষেপের বিষয় হয় ; কারণ কোনো লেখকের লেখা থেকে তাঁর জীবন-চরিত উদ্ধার করা যায় না। তবে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত সমালোচক-দের কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করাও আমি এ যুগের সাহিত্যিকদের কর্তব্য বলে মনে করি। যুগধর্মানুসারে একালে সাহিত্য-সমালোচনাও একরকম বিজ্ঞান। এবং তার জন্য নাকি লোকের ঘরের খবর জানা চাই।

২

সম্প্রতি কোনো সমালোচক আবিষ্কার করেছেন যে, আমি হচ্ছি এ যুগের ভারতচন্দ্র, অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের বংশধর। এমন কথা বলার উদ্দেশ্য আমার নিন্দা করা কি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করা, তা ঠিক বোঝা গেল না। যদি আমার নিন্দা হয় তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতচন্দ্র সে নিন্দার ভাগী হতে পারেন না ; আর যদি ভারতচন্দ্রের প্রশংসা হয় তো সে প্রশংসার উত্তরাধিকারী আমি নই। সম্ভবত সমালোচকের মুখে ভারত-চন্দ্রের স্তুতি ব্যাজস্তুতি, অর্থাৎ বর্ণচোরা নিন্দা মাত্র। এখন এ স্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, যে-জাতীয় নিন্দা-প্রশংসার আমরা অধিকারী ভারতচন্দ্র সে-জাতীয় নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত।

ভারতচন্দ্র আজ থেকে প্রায় একশো আশি বৎসর পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, অথচ আজও আমরা তাঁর নাম ভুলি নি, তাঁর রচিত কাব্যও ভুলি নি, এমন-কি, তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে আজও আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করছি।

অপর পক্ষে আজ থেকে একশো আশি বৎসর পরে বাংলার ক'জন সাহিত্যিকের নাম বাঙালি জাতি মনে করে রাখবে? আমার বিশ্বাস, বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এতদ্ব্যতীত আরো দু-এক জনের নাম হয়তো আগামীকালের বঙ্গ সাহিত্যের কোনো ইতিহাসের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে ; বাদবাকি আমরা সব জলবুদ্‌বুদ্‌, জলে মিশিয়ে যাব।

আর-একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গত একশো আশি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের সভ্যতার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশ এখন ইংরেজের রাজ্য ; আমাদের কর্মজীবন এখন ইংরেজরাজের প্রবর্তিত মার্গ অবলম্বন করেছে। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার ফলে আমাদের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটেছে। অথচ দেশের লোকের জীবনে ও মনে এই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও ভারতচন্দ্র চিরজীবী হয়ে রয়েছেন। এরই নাম সাহিত্যে অমরতা। আর এ ক্ষেত্রে সমালোচনার কার্য লৌকিক নিন্দা-প্রশংসা নয়, এই অমরতার কারণ আবিষ্কার করা ; কিন্তু তা করতে হলে মনকে রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত করতে হয়। অথচ দুর্বিনীত সাহিত্যে রাগই পুরুষের লক্ষণ বলে গণ্য।

৩

সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই এমন দু-একটি সাহিত্যিক থাকেন, যাঁরা লোকমতে যুগপৎ বড়ো লেখক ও দুষ্ট লেখক বলে গণ্য। উদাহরণ স্বরূপ, ইতালিদেশের মাকিয়াভেলির নাম করা যেতে পারে। মাকিয়াভেলির *The Prince* সাহিত্য হিসেবে ও রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে যে ইউরোপীয় সাহিত্যের একখানি অপূর্ব ও অতুলনীয় গ্রন্থ এ কথা ইউরোপের কোনো মনীষী অস্বীকার করেন না, অথচ মাকিয়াভেলি নামটি গাল হিসাবেই প্রসিদ্ধ।

আমাদের ভাষার ক্ষুদ্রপ্রাণ সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের নামটিও উক্ত পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতচন্দ্রের এ দুর্নামের মূলে কতটা সত্য আছে, সেটা এখন যাচিয়ে দেখা দরকার। কারণ কুসংস্কার মাত্রই কালক্রমে সমাজে সুসংস্কার বলে গণ্য হয়। সাহিত্যসমাজেও অনেক সময়ে উক্ত হিসেবে কু সু এবং সু কু হয়ে উঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে এ যুগের সাহিত্যিকদের কতটা মিল আছে সে বিষয়ে ঈষৎ লক্ষ্য করলেই ভারতচন্দ্রের যথার্থ রূপ ফুটে উঠবে।

প্রথমে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করা যাক। বলা বাহুল্য, তার জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা নেই। তবে তিনি নিজমুখেই তাঁর জীবনের দুটি-চারটি মোটা ঘটনা প্রকাশ করেছেন।

আমার অকরুণ সমালোচক বলেছেন যে, ভারতচন্দ্র ও আমি—আমরা উভয়েই—উচ্চব্রাহ্মণবংশে উপরন্তু ভূসম্পন্ন ব্যক্তির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। ভারত-চন্দ্রের সম্বন্ধে ঘটনা যে তাই, তিনি তা গোপন করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন যে—

ভুরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর অন্নদামঙ্গল সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

এখন জিজ্ঞাসা করি, কোনো লেখকের লেখা বিচার করতে বসে তাঁর কুলের পরিচয় নেবার ও দেবার সার্থকতা কি। বিশেষত, সে বিচারের উদ্দেশ্য যখন লেখককে অপদস্থ করা।

যদি পৃথিবীর এমন কোনো নিয়ম থাকত যে, লেখক উচ্চব্রাহ্মণবংশীয় হলেই তাঁকে নিম্নশ্রেণীর লেখক হতে হবে, তা হলে সমালোচক অবশ্য কুলজ্ঞ হতে বাধ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করাটা তো সাহিত্যসমাজে লজ্জার বিষয় নয়। ভারত-চন্দ্রের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু কবি তো জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং তার জন্য তাঁদের ইতিপূর্বে কেউ তো হীনচক্ষে দেখে নি।

শুনতে পাই, ভারতবর্ষের দক্ষিণাপথে Non-Brahmin Movement নামক একটি ঘোর আন্দোলন চলছে, কিন্তু সে শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে। আমি উক্ত আন্দোলনের পক্ষপাতী। কিন্তু উত্তরাপথের সাহিত্যক্ষেত্রেও যে ব্রাহ্মণনিগ্রহের জন্য কোনো দল বদ্ধপরিকর হয়েছে, এমন কথা আজও শুনি নি। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে স্বীকার করছি যে, আমিও সেই সম্প্রদায়ের লোক, যে সম্প্রদায়ের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার আছে। এ বংশে জন্মগ্রহণ করাটা এ যুগে অবশ্য গৌরবের কথা নয়, কিন্তু অগৌরবের কথাও তো নয়।

সম্ভবত সমালোচকের মতে একে ব্রাহ্মণ তায় ভূসম্পন্ন হওয়াটা, একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধের সংযোগের তুল্য। ভারতচন্দ্র এ জাতীয় সমালোচকের মতে যতটা অবজ্ঞার পাত্র, কবিকঙ্কণ বোধ হয় ততটা নন। কারণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীকাব্যের আরম্ভে এই বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন যে—

দামুন্যায় চাষ চষি।

কিন্তু চাষ না চষলে যে বড়ো লেখক হওয়া যায় না, সাহিত্যজগতে তারও কোনো প্রমাণ নেই। কারণ ধানের চাষ পৃথিবীতে একমাত্র চাষ নয়, মনের চাষ বলেও একরকম চাষ আছে, আর সেই চাষেরই ফসল হচ্ছে সাহিত্য। অন্তত এতদিন তাই ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে হয় যে, ভারতচন্দ্রের জাতি ও সম্পত্তির উপর কটাক্ষ করবার এক-মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঙ্গিতে এই কথাটা সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করবার জন্যই সাহিত্যচর্চা তাঁর পক্ষে বিলাসের একটি অঙ্গমাত্র ছিল। সুতরাং তিনি যে সাহিত্য রচনা করেছেন, সে হচ্ছে বিলাসী সমাজের প্রিয়। আজীবন বিলাসের মধ্যে লালিত-পালিত হলে লোকে যে-সরস্বতীর সেবা করে তাঁর নাম নাকি দুষ্ট সরস্বতী। লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন সাহিত্যজগতে যে অনর্থ ঘটায়, এমন কথা অপরের মুখেও, অপর কোনো কবির সম্বন্ধেও শুনেছি। সুতরাং ভারতচন্দ্রের জীবন কতটা বিলাসবৈভবপূর্ণ ছিল, তারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

৪

সমালোচকরা আবিষ্কার করেছেন যে, আমার জীবন হচ্ছে একটি ট্রাজেডি। এক হিসেবে মানুষমাত্রেরই জীবন একটা ট্রাজেডি এবং আমি অবশ্য সাধারণ মানবধর্ম বর্জিত নই। কিন্তু কি কারণে আমার জীবন অনন্যসাধারণ ট্রাজেডি সে কথাটা তাঁরা প্রকাশ করে বলেন নি, বোধ হয় এই কারণে যে, আমার জীবন সুখময় কি দুঃখময়, তা অপরের কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত। আর আমার জীবনের যে-পরিচয় সকলেই পান, তাকে ঠিক ট্রাজেডি বলা চলে না। আমার মাথার উপর চাল আছে, আর সে চালে খড় আছে, আমার ঘরে ক্ষুধার চাইতে বেশি অন্নের সংস্থান আছে, আর সে চালে খড় আছে, আমার ঘরে ক্ষুধার চাইতে বেশি অন্নের সংস্থান আছে, উপরন্তু আমার পরিধানের বস্ত্র আছে, ইংরেজি বাংলা দুরকমেরই। এর বেশি সামাজিক লোকে আর কি চায়? আর যে progress-এর আমরা জাতকে জাত অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়েছি, তারই বা চরম পরিণতি কি? সকলের পেটে ভাত ও পরনে কাপড়ই এ যুগে মানবসভ্যতার চরম আদর্শ নয় কি? সম্ভবত আমার গুণগ্রাহী সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে, আমার সাংসারিক জীবন নয়, সাহিত্যিক জীবনই একটা মস্ত ট্রাজেডি ; অর্থাৎ আমার সাংসারিক জীবন মহা ট্রাজেডি হলে আমার সাহিত্যিক জীবন এত বড়ো প্রহসন হত না।

সে যাই হোক, ও বিষয়ে ভারতচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোনো মিল নেই। ভারতচন্দ্রের সাংসারিক জীবন ছিল সত্যই একটি অসাধারণ ট্রাজেডি। সংক্ষেপে ভারতচন্দ্রের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিবৃত করছি, তার থেকেই প্রমাণ পাবেন যে, তাঁর জীবনের তুল্য ট্রাজেডি বাঙ্গলার কোনো সাহিত্যিকেরই জীবনে নেই ; এমন-কি, তাঁদেরও নেই যাঁদের সাহিত্যিক জীবন হচ্ছে একেবারে ডিভাইন কমেডি।

ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে আমি কোনোরূপ গবেষণা করি নি, কারণ এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল যে, ভগবান আমাকে কোনো বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য এ পৃথিবীতে পাঠান নি। সুতরাং পরের মুখের কথার উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে।

১৩০২ শতাব্দে দ্বারকানাথ বসু নামক জনৈক ব্যক্তি 'কবির জীবনী সম্বলিত' ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেন। এই অখ্যাতনামা প্রকাশকের প্রস্তাবনা হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহ করেছি। আমার বিশ্বাস, বসুমহাশয়ের দত্ত বিবরণ সত্য। কারণ বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে প্রায় একই গল্প বলেছেন ; শুধু বসুমহাশয়ের বঙ্গাব্দ সেনমহাশয়ের হাতে খৃস্টাব্দে পরিণত হয়েছে, এই তফাত।

৫

১৭১২ খৃস্টাব্দে ভারতচন্দ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভূরসুট পরগনার অধিপতি ছিলেন। বর্ধমানাধিপতির সঙ্গে বিবাদে তিনি সর্বস্বান্ত হন।

ভারতচন্দ্রের বয়স তখন এগারো বছর। এই অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যাভ্যাসার্থ লালায়িত হন। পিতার বর্তমান নিঃস্ব অবস্থায় যথারীতি বিদ্যাশিক্ষার অসুবিধা হওয়ায় তিনি 'পলায়ন পূর্বক' মাতুলালয়ে গমন করেন ; এবং তথায় সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান অতি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করেন। উভয় বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ ক'রে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে পেঁড়োয় ফিরে আসেন। অতঃপর তাঁর বিবাহ হয়।

অর্থকরী পারস্য ভাষা শিক্ষা না করে অনর্থকরী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের দ্বারা ভৎর্সিত হয়ে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করেন।

তার পর দেবানন্দপুর গ্রামের জমিদার রামচন্দ্র মুনশির আশ্রয়ে থেকে তিনি অতিপরিশ্রমপূর্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাভ্যাসের জন্য তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। দিনে স্বহস্তে একবার মাত্র রন্ধন করে তাই দু বেলা আহার করতেন। অনেক সময় বেগুনপোড়া ছাড়া আর-কিছু তাঁর কপালে জুটত না। এই সময়ে ভারতচন্দ্র কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। পারস্য ভাষায় বিশেষরূপে বুৎপত্তি লাভ করে তিনি বিশ বৎসর বয়সে বাড়ি ফেরেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তখন তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে ভারতচন্দ্রকে তাঁদের মোক্তার নিযুক্ত করে বর্ধমানের রাজধানীতে তাঁদের হয়ে দরবার করতে পাঠান। রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে কারারুদ্ধ হন। তার পর কারাধ্যক্ষের কৃপায় জেল থেকে পালিয়ে কটকে মারহাট্টাদের সুবেদার শিরতট্টের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। পরে তিনি শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের সঙ্গে বাস করে শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয় পাঠ করেন। ফলে তিনি ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হয়ে গেরুয়া বসন ধারণ করে সদাসর্বদা ধর্মচিন্তায় কালাতিপাত করতেন। তার পর বৃন্দাবনধাম-দর্শন-মানসে তিনি শ্রীক্ষেত্র হতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথিমধ্যে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে তাঁর শ্যালীপতি ভ্রাতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষৎ হয়। তাঁরই অনুরোধে ভারতচন্দ্র আবার সংসারী হতে স্বীকৃত হন, এবং অর্থোপার্জনের জন্য ফরাসডাঙ্গায় দুপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিছুদিন পরে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র টাকা ধার করবার জন্য ইন্দ্র-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারায়ণ চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁরই অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনেয় নিজের সভাসদ্ নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে তিনি অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল শুনে খুশি হয়ে ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দেন এবং সেখানে বাড়ি তৈরি করবার জন্য এককালীন একশো টাকা দান করেন। এই গ্রামেই তিনি ৪৮ বৎসর বয়েসে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

তাঁর শেষবয়েসের ক'টা দিন যে কি ভাবে কেটেছিল, তার পরিচয় তাঁর রচিত নাগাষ্টকে পাওয়া যায়। আমি উক্ত অস্টকের তিনটি মাত্র চৌপদী এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

গতে রাজ্যে কার্যে কুলবিহিতবীর্যে পরিচিতে
ভবেদ্দেশে শেষে সুরপুরবিশেষে কথমপি।
স্থিতং মূলাজোড়ে ভবদনুকল্পাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া
কৃতা সেবা দেবাদধিকমিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতাবাটী গঙ্গাভজনপরিপাটী পুটকিতা
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী
হতাশাদাসাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

৬

যিনি রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করে এগারো বৎসর বয়সে পরভাগ্যোপজীবী হতে বাধ্য হন, যিনি এগারো থেকে বিশ বৎসর পর্যন্ত পরের আশ্রয়ে পরান্নভোজনে জীবন-ধারণ করে বিদ্যা অর্জন করেন, তার পর আত্মীয়স্বজনের জন্য ওকালতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন, তার পর জেল থেকে পালিয়ে স্বদেশ ত্যাগ করে কটকে গিয়ে মারহাট্টাদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তার পর শ্রীক্ষেত্রে বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তার পর আবার গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার জন্য প্রথমে দুপ্লে সাহেবের দেওয়ানের, পরে কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট আশ্রয় পান, আর তথায় মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনের চাকর হয়ে কাব্যরচনা করেন, এবং শেষকালে গঙ্গাতীরে বাস করতে গিয়ে আবার বর্ধমান-রাজার কর্মচারিগণ কর্তৃক নানারকম উৎপীড়িত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি যে কতটা বিলাসের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছিলেন তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এরূপ জীবন কল্পনা করতেও আমাদের আতঙ্ক হয়। আমাদের জীবন আজও অবশ্য হ্রাসবৃদ্ধির নিয়মের অধীন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো অবস্থার বিপর্যয় আজ কারো কপালে ঘটে না। ভারতচন্দ্রের জীবন দেশব্যাপী ভূমিকম্প ও ঝড়-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলের ভিতর কেটে গেছে। সেকালের দেশের অবস্থা যদি কেউ জানতে চান, তা হলে তিনি অন্নদামঙ্গালের গ্রন্থসূচনা পড়ুন। সেকালে এ দেশের লোকের আরামও ছিল না, বিলাসী হবার সুযোগও ছিল না। ভারতচন্দ্র বলেছেন—

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

সে যুগে দেশের কোনো লোকের হাতে ক্ষণেকের জন্য চাঁদ আসুক আর না আসুক, অনেকের ভাগ্যেই ক্ষণে হাতে দড়ি পড়ত। ভারতচন্দ্রের তুলনায় আমরা সকলেই আলালের ঘরের দুলাল, অর্থাৎ আমরা সকলেই কলের জল খাই, রেলগাড়িতে ঘোরাফেরা করি, পদব্রজে পুরী থেকে বৃন্দাবন তো দূরের কথা, শ্যামবাজার থেকে কালীঘাটে যেতে প্রস্তুত নই ; এবং চল্লিশ টাকা মাস-মাইনেয় কাব্য লেখা দূরে থাক্, অত কমে আমরা কেউ মাসিক পত্রের এডিটারি করতেও নারাজ। নিজেরা আরামে আছি বলে আমরা মনে করি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা সব দাঁতে হীরে ঘষতেন আর তাঁদের ঘরে রুইমাছ ও পালং শাক ভারে ভারে আসত।

৭

এ হেন অবস্থায় পড়লে শতকরা নিরানব্বই জন লোকের মন বিষাক্ত ও রসনা কণ্টকিত হয়ে ওঠে, এবং বিলাসীর মন তো একেবারে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এখন দেখা যাক, সাংসারিক জীবনের এত দুঃখকষ্ট ভোগ করে ভারতচন্দ্রের মনের আলো নিবে গিয়েছিল, না, আরো জ্বলে উঠেছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে যে পতিনিন্দা করিয়েছেন, সেই নিন্দার ভিতরই আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাব। সেই নিন্দাবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র জোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
নানাশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে কত বলে বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু॥

এই ব্যাজনিন্দা হচ্ছে ভারতচন্দ্রের আত্মকথা। ঐ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিসের পরিচয় পাই : রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন্‌কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় শেক্‌সপীয়ার বলে গণ্য, সেই Cervantes সের্‌ভান্তেসের জীবন বিষম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্যজগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ-জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনের সুখদুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই। এ হাসির মূলে কি আছে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে দিয়েছেন। তার কথা হচ্ছে এই—

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥

৮

পূর্বেই বলেছি ভারতচন্দ্রের জীবনীর বিষয় বিশেষ কিছু জানা নেই। তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গল, মানসিংহ, সত্যনারায়ণের পুঁথি প্রভৃতিতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাই অবলম্বন করে এবং লোকমুখে তাঁর সম্বন্ধে কিংবদন্তী শুনে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর যে জীবনচরিত লেখেন, সেই জীবনচরিত থেকেই তাঁর পরবর্তী লেখকেরা তাঁর জীবনের ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। সেই ইতিহাসটি আপনাদের কাছে এইজন্য ধরে দিলুম যে, আপনারা সকলেই দেখতে পাবেন যে, তাঁর কাব্যের দোষগুণ তাঁর অসার চরিত্রের ফুল কিংবা ফল নয়, বরং ঠিক তার উলটো। তাঁর কাব্যের চরিত্র যাই হোক, তাঁর নিজের চরিত্র ছিল অনন্যসাধারণ আত্মবশ। দ্বিতীয়ত, তাঁর ঘোর দুঃখময় জীবনের ছায়া তাঁর কাব্যের গায়ে পড়ে নি। ব্যাপারটির প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য। কারণ তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, মানুষের মন তার জীবনের বিকার মাত্র। বিশেষত, যারা অচেতচিত্ত, তাদের মনে এই ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়েছে। তা যে হয়েছে তার প্রমাণ, এ যুগে ইউরোপে বহু কবি আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা শুধু নিজের সুখদুঃখের গান গেয়েছেন—কখনো হেসে, কখনো কেঁদে। প্রথমপুরুষকে উত্তমপুরুষ গণ্যে তারই কথাই হয়েছে তাঁদের কাব্যের মাল ও মসলা। কিন্তু এঁদেরও এই য বস্তুটি যে ক্ষেত্রে অহং সে ক্ষেত্রে তাঁরা অকবি, আর যে ক্ষেত্রে তা আত্মা সে ক্ষেত্রে তাঁরা কবি। অহং ও আত্মা যে এক বস্তু নয়, সে কথা কি এ দেশে বুঝিয়ে বলা দরকার? ভারতচন্দ্র ছোটো হোন বড়ো হোন—জাতকবি, সুতরাং তাঁর অহংএর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারত-চন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত এ-সব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। সুখের বিষয়, সংস্কৃত কবিদের জীবনচরিত আমাদের কাছে অবিদিত, নচেৎ সমা-লোচকদের হাতে তাঁরাও নিস্তার পেতেন না।

৯

আন্দাজ দশ-বারো বৎসর আগে আমি দারজিলিং শহরে একটি সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষায় একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। পরে দেশে ফিরে সেই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করি। বলা বাহুল্য, প্রাক-বৃটিশ যুগের, ভাষান্তরে নবাবি আমলের, বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের নাম উহ্য রাখা চলে না। তাই উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দর-নামক কাব্যের দোষগুণ বিচার করতে আমি বাধ্য হই। সে প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের অতিপ্রশংসাও নেই, অতিনিন্দাও নেই। এর কারণ নিন্দা-প্রশংসায় যাঁরা সিদ্ধহস্ত, তাঁদের ও-বিষয়ে অতিক্রম করবার আমার প্রবৃত্তিও নেই, শক্তিও নেই। কারো পক্ষে অথবা বিপক্ষে জোর ওকালতি করা আমার সাধ্যের অতীত। প্রমাণ, আমি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাস করেছি কিন্তু আদালতের পরীক্ষায় ফেল হয়েছি। ভারতচন্দ্র বলেছেন, উকিলের—

সবে গুণ, যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে।

সাহিত্যের আদালতে এ গুণের গুণগ্রাহীরা আমাকে নির্গুণ বলেই প্রচার করেছেন।

সে যাই হোক, উক্ত প্রবন্ধ থেকেই সাধু সাহিত্যাচার্যেরা ধরে নিয়েছেন যে, আমি আর ভারতচন্দ্র দুজনে হচ্ছি পরস্পরের মাসতুতো ভাই। আমি উক্ত ইংরেজি প্রবন্ধটি আজ আবার পড়ে দেখলুম, তাতে এমন একটিও কথা নেই যা আমি তুলে নিতে প্রস্তুত। সমালোচকদের স্থূলহস্তাবলেপের ভয়ে আমি আমার মতামতকে ডিগবাজি খাওয়াতে শিখি নি।

যা একবার ইংরেজিতে বলেছি, বাংলায় তার পুনরুক্তি করবার সার্থকতা নেই। শুধু তার একটি মত সম্বন্ধে এ ক্ষেত্রে দু-চার কথা বলতে চাই। সে কথাটি এই—

Bharatchandra, as a supreme literary craftsman, will ever remain a master to us writers of the Bengali language.

১০

আমি এখন লেখক হিসেবেই, পাঠক হিসেবে নয়, ভারতচন্দ্রের লেখার সম্বন্ধে আরো দু-চারটি কথা বলতে চাই। আমি যে একজন লেখক, সে কথা অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেন না, যাঁরা আমার লেখা আদ্যোপান্ত পড়েছেন, এমন-কি, তার microscopic examination করেছেন। ভাগ্যিস আমাদের চোখের জ্যোতি এক্স-রে নয়, তা হলে আমরা চার পাশে শুধু নরকঙ্কাল দেখতে পেতুম। কিন্তু আপনারা যে আমাকে লেখক বলে গণ্য করেন, তার প্রমাণ, আপনারা আমাকে এই উচ্চ আসন দিয়েছেন, আমি বক্তা বলে নয়, লেখক বলে।

ভারত অন্নদামঙ্গালের আরম্ভেই একবার বলেছেন—

কৃষ্ণচন্দভক্তি আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে।

তার পর আবার বলেছেন—

নূতন মঙ্গাল আশে ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা যুগপৎ সরল করে ও সরস করে বলতে চায় শুধু সাহিত্যিকরা ; কারণ কোনো সাহিত্যিকই অসরস ও অসরল কথা ইচ্ছে করে বলে না ; তবে কারো কারো স্বভাবের দোষে বিরস ও কুটিল কথা মুখ থেকে অনর্গল বেরোয়।

আমি এ কথা স্বীকার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, আমি সরল ও সরস ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেছি। তবে তাতে অকৃতকার্য হয়েছি কি না, তার বিচারক আমি নই, সাহিত্যসমাজ।

ভাষামার্গে আমি ভারতচন্দ্রের পদানুসরণ করেছি। এর কারণ আমিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করেছি। আমি পাঁচ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরে আসি, আর পনেরো বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর ছাড়ি। এই দেশই আমার মুখে ভাষা দিয়েছে, অর্থাৎ এ দেশে আমি যখন আসি তখন ছিলুম আধ-আধভাষী বাঙাল, আর স্পষ্টভাষী বাঙালি হয়ে এ দেশ ত্যাগ করি। আমার লেখার ভিতর যদি সরলতা ও সরসতা থাকে তো সে দুটি গুণ এই নদীয়া জিলার প্রসাদে লাভ করেছি। ফলে বাংলায় যদি এমন কোনো সাহিত্যিক থাকেন, যিনি

কহিলে সরস কথা বিরস বাখানে,

তাঁকে দূর থেকে নমস্কার করি মনে মনে এই কথা ব'লে যে, তোমার হাতযশ আর আমার কপাল।

১১

ভারতচন্দ্র লেখার ভিতর কোন্ কোন্ গুণের আমরা সাক্ষাৎ লাভ করব তার সন্ধান তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেন যে—

পড়িয়াছি যেই মতো লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥

ভারতচন্দ্রের যা পড়েছিলেন তা যে লিখতে পারতেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, কারণ নিত্য দেখতে পাই হাজার হাজার লোক তা করতে পারে। এই বাঙ্লাদেশে প্রতি বৎসর স্কুলকলেজের ছেলেরা যখন পরীক্ষা দেয় তখন তারা যেই মতো পড়িয়াছে সেই মতো লেখা ছাড়া আর কি করে? আর যে যত বেশি পড়া দিতে পারে সে তত বেশি মার্ক পায়। তবে সে-সব লেখা যে, 'বুঝিবারে ভারি' তা তিনিই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন, যিনি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনো কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনো বিদ্যার পরীক্ষক হয়েছেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, ও-জাতীয় লেখার ভিতর প্রসাদগুণও নেই, রসও নেই, আছে শুধু বই-পড়া মুখস্থ পাণ্ডিত্য। আশা করি, বাঙালি জাতি কস্মিন্কালেও বিলেতি 'বিদ্যাভ্যাসাৎ' এতদূর জড়বুদ্ধি হয়ে উঠবে না যে, উক্ত জাতীয় লেখাকে সাহিত্য বলে মাথায় তুলে নৃত্য করবে। ভারতচন্দ্র কি পড়েছিলেন ও ছিলেন জানেন ? —

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তিনি যেই মতো পড়েছিলেন, সেই মতো লেখেন নি কেন, তাই বুঝলে সাহিত্যের ধর্ম যে কি, সকলের কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ যুগে আমরা কোনো কবির জজ কিংবা উকিলকে ক্রিটিক বলে গণ্য করি নে, সাহিত্যসমাজের পাহারাওয়ালাদের তো নয়ই। তাঁকেই আমরা যথার্থ সমালোচক বলে স্বীকার করি, যিনি সাহিত্যরসের যথার্থ রসিক। এ জাতীয় রসগ্রাহীরা জানেন যে, সাহিত্যের রস এক নয়, বহু এবং বিচিত্র। সুতরাং কোন্ লেখকের লেখায় কোন্ বিশেষ রস বা বিশেষ গুণ ফুটে উঠেছে তাই যিনি ধরতে পারেন ও পাঁচজনের কাছে ধরে নিতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ক্রিটিক।

১২

এখন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রসাদগুণ যে অপূর্ব, এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সে-গুণ সম্বন্ধে কোনো চক্ষুষ্মান্ বাঙালির পক্ষে অন্ধ হওয়া অসম্ভব। এখন, এই সর্ব-আলংকারিক-পূজিত গুণটি কি? যে লেখা সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য সেই লেখাই কি প্রসাদগুণে গুণান্বিত? তা যদি হত, তা হলে কালিদাসের কবিতার চাইতে মল্লিনাথের টীকার প্রসাদগুণ ঢের বেশি হত। তা যে নয় তা সকলেই জানে। প্রসাদগুণ হচ্ছে ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ। ভারতচন্দ্রের হাতে বঙ্গ-সরস্বতী একেবারে 'তন্বীশ্যামা শিখরদশনা' রূপ ধারণ করেছেন। যাঁর অন্তরে বঙ্গ ভাষা এই প্রাণবন্ত সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করেছে, তাঁর যে কবিপ্রতিভা ছিল, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষাকে শাপমুক্ত করা যদি তাঁর একমাত্র কীর্তি হত তা হলেও আমরা বাঙালি লেখকেরা তাঁকে আমাদের গুরু বলে স্বীকার করতে তিলমাত্র দ্বিধা করতুম না। অমন সরল ও তরল ভাষা তাঁর পূর্বে আর কেউ লিখেছেন বলে আমি জানি নে। আর আমি অপর কোনো সাহিত্য জানি আর না-জানি, বাঙ্গলা সাহিত্য অল্পবিস্তর জানি।

আমি পূর্বোক্ত ইংরেজি প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষার মহা গুণকীর্তন করি, কিন্তু সে ভুল করে। সেকালে আমার চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এখন দেখছি উক্ত পদাবলীর ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা নয়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুখে রূপান্তরিত হয়েই চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা যে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে, সে বিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের হিস্টরি লেখা হয়েছে, কিন্তু এখনো সে সাহিত্যের জিয়োগ্রাফি লেখা হয় নি। যখন সে জিয়োগ্রাফি রচিত হবে তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন যে, ভারতচন্দ্রের এ উক্তি সত্য যে, নবদ্বীপ সেকালে ছিল—

ভারতীর রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ।

আমি বলেছি যে, প্রসাদগুণ ভাষার গুণ, কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে, ভাষা ছাড়া ভাব নেই। নীরব কবিদের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি নে। যা আমরা ভাষার গুণ বলি তা হচ্ছে মনের গুণেরই প্রকাশ মাত্র। অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং প্রসাদগুণ হচ্ছে আসলে মনেরই গুণ, ও-বস্তু হচ্ছে মনের আলোক।

১৩

ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে, তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে ও তা হবে রসাল। এ দুই বিষয়েই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। গোল তো এইখানেই। যে রস তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ রস সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। কেননা তা হচ্ছে আদিরস। উক্ত রসের শারীরিক ভাষ্য এ যুগের কাব্যে আর চলে না, চলে শুধু দেহতত্ত্ব নামক উপবিজ্ঞানে।

সাদা কথায় ভারতচন্দ্রের কাব্য অশ্লীল। তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা অলংকার ও সাধুভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

এ স্থলে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা ও সংস্কৃত কবিরা কি খুব শ্লীল? রামপ্রসাদ অনেকের কাছে মহা সাধুকবি বলে গণ্য। গান-রচয়িতা রামপ্রসাদ নিষ্কলুষ কবি, কিন্তু বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদও কি তাই? চণ্ডীদাস মহাকবি, কিন্তু তাঁর রচিত কৃষ্ণকীর্তন কি বিদ্যাসুন্দরের চাইতেও সুরুচিসম্পন্ন? এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই মাত্র কি না যে, বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা আবৃত ও কৃষ্ণকীর্তনের অনাবৃত? আমি ভারতচন্দ্রের কাব্যের এ কলঙ্কমোচন করতে চাই যে, কেননা তা করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্য একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি? এর প্রথম কারণ, ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কাব্যে তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের কাছে শুধু nature। ভারতচন্দ্র যা দিয়ে তা ঢাকা দিতে গিয়েছিলেন তাতেই তা ফুটে উঠেছে। তাঁর ছন্দ ও অলংকারের প্রসাদেই তাঁর কথা কারো চোখ-কান এড়িয়ে যায় না। পাঠকের পক্ষে ও-জিনিস উপেক্ষা করবার পথ তিনি রাখেন নি। তবে এক শ্রেণীর পাঠক আছে যাদের কাছে ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা ততটা চোখে পড়ে না যতটা পড়ে তার আর্ট। তার পর ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।

১৪

ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে এ রসের নাম আছে, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে এ রসের বিশেষ স্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। সংস্কৃত নাটকে বিদূষকদের রসালাপ শুনে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু সে তাদের কথায় হাস্যরসের একান্ত অভাব দেখে। ও হচ্ছে পেটের দায়ে রসিকতা।

বাংলার প্রাচীন কবিরা কেউ এ রসে বঞ্চিত নন। শুধু ভারতচন্দ্রের লেখায় এটি বিশেষ করে ফুটেছে। ভারতচন্দ্র এ কারণেও বহু সাধু ব্যক্তিদের কাছে অপ্রিয়। হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।

ভারতচন্দ্রের কাব্য যে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট সে কথা তো সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁর হাসিও নাকি জঘন্য। সুন্দরের যখন রাজার সুমুখে বিচার হয় তখন তিনি বীরসিংহ রায়কে যে-সব কথা বলেছিলেন তা শুনে জনৈক সমালোচক-মহাশয় বলেছিলেন যে, শ্বশুরের সঙ্গে এহেন ইয়ারকি কোন্ সমাজের সুরীতি? আমিও জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সমালোচনা কোন্ সাহিত্যসমাজের সুরীতি? এর নাম ছেলেমি না জ্যাঠামি? তাঁর নারীগণের পতিনিন্দাও দেখতে পাই অনেকের কাছে নিতান্ত অসহ্য। সে নিন্দার অশ্লীলতা বাদ দিয়ে তার বিদ্রূপেই নাকি পুরুষের প্রাণে ব্যথা লাগে। নারীর মুখে পতিনিন্দার সাক্ষাৎ তো ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী অন্যান্য কবির কাব্যেও পাই। এর থেকে শুধু এই প্রমাণ হয় যে, বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতির মুখে পতিনিন্দা এষো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। এ স্থলে পুরুষজাতির কিং কর্তব্য? হাসা না কাঁদা? বোধ হয় কাঁদা, নচেৎ ভারতের হাসিতে আপত্তি কি! আমি উক্তজাতীয় স্বামী-দেবতাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, দেবতার চোখে পলকও পড়ে না, জলও পড়ে না। আমাদের দেবদেবীর পুরাণকল্পিত চরিত্র, অর্থাৎ স্বর্গের রূপকথা, নিয়ে ভারতচন্দ্র পরিহাস করেছেন। এও নাকি তাঁর একটি মহা অপরাধ। এ যুগের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত রূপকথায় কি এতই আস্থাবান যে উক্ত পরিহাস তাঁদের অসহ্য? ভারত-সমালোচনার যে ক'টি নমুনা দিলুম তাই থেকেই দেখতে পাবেন যে, অনেক সমালোচক কোন্ রসে একান্ত বঞ্চিত। আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধুপুরুষ ও যে হাসাতে পারে সেই যে ইতর, এহেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি।

আমি আর-একটা কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করেই এ যাত্রা ক্ষান্ত হব। এ দেশে ইংরেজের শুভাগমনের পূর্বে বাংলাদেশ বলে যে একটা দেশ ছিল, আর সে দেশে যে মানুষ ছিল, আর সে মানুষের মুখে যে ভাষা ছিল, আর সে ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হত, এই সত্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এই নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ সত্য বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ, যেহেতু আমাদের শিক্ষাগুরুদের মতে বাঙালি জাতির জন্ম-তারিখ হচ্ছে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বশেষে আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা ভারতচন্দ্রের কথাতেই করি। আপনারা আমাকে এ সভায় কথা কইতে আদেশ করেছেন—

সেই আজ্ঞা অনুসরি কথা শেষে ভয় করি
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখো দুষ্ট মতো
সাম্নি দিবা এই নিবেদন।

শ্রাবণ ১৩৩৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~